আমাদের মিয়া ভাই

মাসুম আওয়াল

বছর পাঁচেক আগের কথা। তখন একটা অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিনোদন সাংবাদিক আমি। পেশাগত প্রয়োজনেই অসংখ্য তারকাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো। চিত্রনায়ক ফারুক তখনও এমপি নন। মাঝে মধ্যেই এফডিসিতে আসতেন। শিল্পী সমিতির অফিসে বসতেন। সাংবাদিকরা গেলে বেশ খোলা মেজাজে কথা বলতেন। সেই সময় অনেকবার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কথাও হয়েছে। যেকোনো প্রয়োজনে তাকে ফোন করলেও সাড়া দিতেন। কথা বলতেন। অনেক নিউজের কমেন্ট নিয়েছি ফোনেই। এসব এখন শুধুই স্মৃতি। তিনি চলে গেলেন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর দেখা হবে না তার সঙ্গে। ফোন করে আর পাওয়া যাবে না তাকে। চিত্রনায়ক ফারুক আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তার কাজগুলো। তরুণ প্রজন্ম তাকে মনে রাখবে সেইসব কাজের জন্য। গুণী এই মানুষটির জীবনের গল্প থেকে নতুন প্রজন্মের তারকারা খুঁজে নিবেন নতুন পথ।

ডানপিটে সেই ছেলেটি

ফারুক নামে পরিচিত হলেও তার পুরো নাম আকবর হোসেন পাঠান দুলু। ১৯৪৮ সালের ১৮ আগস্ট আজগার হোসেন খান পাঠানের ঘর আলোকিত করে আসেন তিনি। ফারুকের জন্ম ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জে ঘিওরের এক গ্রামে হলেও তিনি বেড়ে উঠেছেন পুরান ঢাকায়। তার শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে পুরান ঢাকায়। পাঁচ বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট ফারুক ছিলেন ডানপিটে ও চঞ্চল। সুযোগ পেলেই ছুটতেন মাঠে-ঘাটে। গাজীপুরের কালিগঞ্জে ছিল তার পৈত্রিক নিবাস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'কালিগঞ্জে আমাদের চারশ বছরের বসতি। ভাওয়াল ছাড়া এতো পুরোনো লোক নেই ওখানে। ঈশা খাঁ, ভাওয়াল এবং পাঠান এই তিন বংশ থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি ফারুক পাঠান। সুতরাং এখানে আমাদের একটা ঐতিহ্য আছে।' বিবিসি বাংলাকে ২০১৬ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফারুক মজা করে বলেছিলেন, 'একসময় পাড়া-মহল্লায় নাটক বা কোনও অনুষ্ঠান পণ্ড করাই ছিল তার কাজ। ২০ টাকার বিনিময়ে ডিম ছুড়ে ভুন্ডুল করে দিতেন সেসব আয়োজন। যুদ্ধ জাহাজ চালানোর স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলায়, কিন্তু হয়ে গেলেন অভিনেতা।' হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে তিনি বলেছিলেন 'অনেক সময় ভুলে যাই নিজেকে। কিছুক্ষণ পরে পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারি আমি একজন সাধারণ মানুষ।'

রাজনীতি পাল্টে দিলো জীবন

লেখাপড়ায় উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তারুণ্যে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে স্বাধীকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে ছয় দফা আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিশি হয়রানির শিকার হন তিনি; ৩৭টি মামলার আসামি করা হয় তাকে। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ফারুক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। রাজনীতিই পাল্টে দেয় ফারুকের জীবন।

দুলুর ফারুক হয়ে ওঠা

ছাত্রজীবনে পুরান ঢাকায় মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনেতা হওয়ার বীজটা বপন হয় তখনই। এরপর ১৯৭১ সালে এইচ আকবর পরিচালিত 'জলছবি' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন আকবর হোসেন পাঠান দুলু। সিনেমাতে নেমেই পাল্টে যায় নাম। জানা যায়, অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান, পরিচালক এইচ আকবর এবং ফারুক নামে তার নিজের একজন বন্ধু মিলে এই নাম দিয়েছিলেন তার। 'ফারুক' নামে পরিচিত হয়ে হঠেন তিনি।

হয়ে উঠলেন ব্যস্ত অভিনেতা

'জলছবি' চলচিত্রে ফারুকের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে কবরী অভিনয় করেন। ১৯৭৩ সালে খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'আবার তোরা মানুষ হ' সিনেমাতে অভিনয় করেন ফারুক। সিনেমাটি পছন্দ করে দর্শক। সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকাই সিনেমায় অন্যতম একজন ব্যস্ত নায়ক হয়ে যান তিনি।

গ্রামীণ প্রতিবাদী চরিত্রে সেরা ফারুক

গ্রামীণ প্রতিবাদী চরিত্রে অনন্য ছিলেন চিত্রনায়ক ফারুক। গ্রামীণ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে মূল্যায়ন পেয়েছেন তিনি। অসংখ্য দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছেন। আরেক নন্দিত অভিনেতা ও নির্মাতা সোহেল রানা গণমাধ্যমে বলেছিলেন, 'গ্রামীণ প্রতিবাদী চরিত্রে অভিনয়ে নায়ক ফারুকের অবস্থানে এখনও কেউ আসতে পারেনি। আমি যতটুকু দেখেছি এবং জনসাধারণের পালস যতটুকু বুঝি, সেটা হচ্ছে, গ্রামীণ এবং প্রতিবাদী চরিত্র যদি ন্যায়ের পক্ষের হয়, তাহলে সেই চরিত্রে ফারুক অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং তুলনাহীন শিল্পী ছিল।'

অভিনয় জীবনের সোনালি সময়

১৯৭৪ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'আলোর মিছিল' চলচ্চিত্রে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত 'সুজন সখী' ও 'লাঠিয়াল' দুটি ব্যবসাসফল ও আলোচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং লাঠিয়াল চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব চরিত্র অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত তিনটি সিনেমা 'সূর্যগ্রহণ', 'মাটির মায়া' ও 'নয়নমনি'। চলচ্চিত্র তিনটি বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। পরের বছর শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'সারেং বৌ' ও আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'গোলাপী এখন ট্রেনে' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্র দুটি নারীকেন্দ্রিক হলেও তার অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৭৯ সালে তার অভিনীত 'নাগরদোলা', 'দিন যায় কথা থাকে', 'কথা দিলাম', 'মাটির পুতুল', 'সাহেব', 'ছোট মা', 'এতিম', 'ঘরজামাই' চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসাসফল হয়। ১৯৮০ সালে 'সখী তুমি কার' ছায়াছবিতে শাবানার বিপরীতে শহুরে ধনী যুবকের চরিত্রে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেন।

হলেন সবার মিয়া ভাই

১৯৮৭ সালে 'মিয়া ভাই' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ফারুক। এই চলচ্চিত্রটির সাফল্যের পরই তিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনে 'মিয়া ভাই' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। চিত্রনায়িকা রোজিনা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ফারুক কেবল নায়ক চরিত্রে পর্দায়ই জনপ্রিয় ছিলেন না, সহকর্মীদের কাছেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। ফারুক কেবল অভিনয়ে একজন বড় শিল্পী ছিলেন না, তিনি মানুষ হিসাবেও ছিলেন অনেক বড় মাপের। তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সবার কাছে ছিলেন মিয়া ভাই, সবাই তাকে মিয়া ভাই বলে ডাকতাম। আমাদের শিল্পের কারও কোনো সমস্যা হলেই তিনি সাহায্যে এগিয়ে আসতেন।'

মিয়া ভাইয়ের নায়িকারা

সুদর্শন যুবক ও নিপুণ অভিনয়ে পারদর্শী ফারুক খুব সহজেই প্রবেশ করেন বড় পর্দায়। নজর কাড়েন অন্যসব পরিচালকদের। কিংবদন্তি অভিনেত্রী কবরী তখন হিট। প্রথম চলচ্চিত্রে ফারুক অভিনয় করেন তার সাথে। অন্য নায়িকাদের সঙ্গেও নতুন নতুন চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছিলেন। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ফারুককে। একে একে উপহার দিয়েছিলেন ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র। তার বিপরীতে অভিনয় করেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি সব অভিনেত্রী। তার মধ্যে রয়েছেন কবরী, ববিতা, সুচরিতা, রোজিনা, সুচন্দা, অঞ্জু ঘোষ, অঞ্জনা, শাবানা, নিপা মোনালিসা, সুনেত্রাসহ আরো অনেক নায়িকারা। সত্তর ও আশির দশকের সব শীর্ষ নায়িকার বিপরীতে কাজ করলেও ববিতা-ফারুক জুটিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

চলচ্চিত্রের বাইরের মিয়া ভাই

চলচ্চিত্রের বাইরে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। ফারুক স্কুল জীবন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফারুক ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে ঢাকা ১৭ আসন থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত হন।

ব্যবসায়িক জীবন

চলচ্চিত্রের বাইরে ফারুক একজন ব্যবসায়ী। তিনি গাজীপুরে অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'ফারুক নিটিং ডায়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন দীর্ঘদিন।

ব্যক্তিগত জীবন

ফারুক ফারজানা পাঠানকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। কন্যা ফারিহা তাবাসসুম পাঠান ও পুত্র রওশন হোসেন।

অসুস্থতা

২০১২ সালের জুলাইয়ে নায়ক ফারুক এক মাস ধরে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত রোগে ভুগছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ২০১৩ সালের ৩০ আগস্ট সিঙ্গাপুরে যান ও সেখানকার মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা শেষে ২০১৪ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে আসেন। ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভীষণ জ্বর নিয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। ২০২১ সালের ১৫ মার্চ খিচুনি হওয়ার পরে তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৮ মার্চ অবস্থার উন্নতি হলেও ২১ মার্চ আবার অচেতন হলে আইসিইউতে নেওয়া হয়।

না ফেরার দেশে

অসুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করে অবশেষে ২০২৩ সালের ১৫ মে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ১৬ মে মঙ্গলবার ভোরের ফ্লাইটে ঢাকায় আনা হয় তার মরদেহ। ওইদিন সন্ধ্যা ৭টায় তাকে গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জে নেওয়া হয়। সেখানে দখিন সোম টিওরী জামে মসজিদে জানাজা শেষে পাঠান বাড়ি পারিবারিক কবরস্থানে বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয় ফারুককে।

নায়ক ফারুকের শেষ কথা

মৃত্যুর দুদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে ফারুকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। বলেছিল, 'ভাই ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে দ্রুতই আমি বাড়ি ফিরব। বাড়ি ফিরলো ঠিকই কিন্তু জীবিত নয়, লাশ হয়ে।' চিত্রনায়ক ফারুক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার ফুফাতো ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম হুমায়ুন মাস্টার বলছিলেন কথাগুলো। তিনি বলেন, 'আমার মামা ও ফারুকের বাবা আজগর হোসেন পাঠান একজন চিকিৎসক ছিলেন। মামার চাকরির সুবাদে ফারুকের জন্ম হয় মানিকগঞ্জের ঘিওরে। মায়ের কাছে শুনেছি আমার বয়স তখন ৬ মাস। আমার মা ফারুককে দেখতে আমাকে কোলে নিয়ে ঘিওরে গিয়েছিলেন। সে বয়সে আমার ৬ মাসের ছোট হলেও বাড়িতে আসলে আমাকে সবসময় ডাকতেন। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল একেবারে বন্ধুর মতো। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব নাটক প্রিয় ছিলেন। ঢাকায় কোনো কাজকর্ম না থাকলে গ্রামে চলে আসতেন নাটক করতে এবং গ্রামে বিভিন্ন চরিত্রে তিনি অভিনয় করে স্থানীয়দের মন জয় করে নিতেন।' এভাবেই চিরকাল সবার ভালোবাসার মানুষ হয়ে থাকবেন ফারুক। শিল্পীরা এভাবেই তাদের কাজের মধ্যে বাঁচেন।